সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

আল্লাহর ওলিকে অবমাননা করা স্বয়ং আল্লাহকে অবমাননা করার শামিল। বেলায়েত হচ্ছে নবুয়তের অংশ। নবুয়তের ভার বহন করাকেই বেলায়েত বলা হয়।

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

আশ্বিন ১৪২২, সেপ্টেম্বর ২০১৫, জিলকদ ১৪৩৬

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

বিশ্বাস আছে তাই বিশ্বাসের পথ চেয়ে থাকা

মতিন: হুজুর, মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনা একটা দুর্গম পথে যাত্রার মতোই কষ্টসাধ্য। বারেবারে পা পিছলে যায়। কেউ কেউ সে পথে হারিয়ে যায়। খুব কম লোকই গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। একথা মনে হলে কেমন যেন একটা হতাশা সমস্ত মনকে ছেয়ে ফেলে।

গুরু: দেখো মতিন, ঐ দুর্গম পথে রক্ষাকবচ না নিয়ে পথ চললে, ভুল তো অনিবার্যরূপেই হবে।।

মতিন: হুজুর, কোন রক্ষাকবচের কথা বলছেন আপনি।

গুরু: তোমার গন্তব্য যদি হয় আল্লাহর নৈকট্য– তাঁর একান্ত সান্নিধ্য, তাহলে তোমাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে হবে তাঁর মহান অস্তিত্বে– তাঁর তুলনাহীন ওয়াহদানিয়াত বা একত্বে।

মতিন: হুজুর আমরা তো তাঁকে মেনেই নিয়েছি। বলেছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ– তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

গুরু: না, এই বলার এবং বিশ্বাসের মধ্যে ফারাক আছে। বললেই বিশ্বাস করা হয় না। আবার বিশ্বাস ততোক্ষণ পূর্ণতা লাভ করে না যতোক্ষণ তা চিন্তা থেকে কর্মে রূপান্তরিত না হয়।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ– কথাটার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আমি নেই, কিছু নেই– তুমি আছো। তুমি মুখে বলছো আমি নেই, কিছু নেই– কিন্তু পৃথিবীর এ মেলায় আগত যাত্রী কি সত্যি বলতে পারে আমি নেই, কিছু নেই। প্রতিটি মানুষের মাঝেই একটা 'আমিত্ব' উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে। আমার অর্থ, আমার বিত্ত, আমার সন্তান, আমার স্ত্রী, আমার ক্ষমতা– এই আমার আমার বলে যে মোহমত্ত মানুষটি, তার মধ্যেও কিন্তু একটা 'আমি' বাস করে। এই আমিটা আমা-সর্বস্ব লোকটা থেকে পৃথক। যা হোক পৃথিবীর বেশিরভাগ লোকই তো এই আমা-তাড়িত ব্যক্তিত্ব। এরা সবাই কালেমা পড়ে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। তাই বলে কি বলা যাবে এরা সত্যি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কথাটায় বিশ্বাস করে?

মতিন: মানুষ তো এ সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ। কিছুটা স্বার্থের কথা সে বলবেই হুজুর!

গুরু: আমরা তো এখানে সংসারীদের কথা বলছি না। বলছি পরহেজগারদের কথা, আধ্যাত্মিক সাধকদের কথা। সুতরাং তুমি স্বীকার করছো যে ঐ আমা-তাড়িত মানুষগুলো সম্পূর্ণত আল্লাহর ক্ষমতাকে মেনে নেয়নি। যতোক্ষণ পর্যন্ত ঐ বীজমন্ত্রটিতে বিশ্বাস না করবে পরিপূর্ণভাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তুমি পথ চলতে পারো কিন্তু তোমার গন্তব্যে কখনই পৌঁছবে না, একথা নিশ্চিত জেনে রেখো।

মতিন: তাহলে আমরা কি এই ধরে নেবো যে আমাদের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সম্ভব হবে না।

গুরু: নিরাশ হতে আল্লাহ নিজেই বারণ করেছেন। কারণ তাহলে তোমার ইমান চলে যাবে। তোমাকে ক্রমাগত চেষ্টা করতে হবে। সুরা হিজরের শেষ আয়াতে এরশাদ হচ্ছে– ওয়া'বুদ রাব্বাকা হাত্তা-ইয়া'তিয়াকাল ইয়াকিন। তোমার রবের এবাদত করো– তাঁর ভজন করো যতোক্ষণ পর্যন্ত না তোমার বিশ্বাস আসে। অর্থাৎ তাঁর উপাসনা করো, তাঁর আরাধনা করো এমন নিবিষ্টচিত্তে, এমন নিবেদিতপ্রাণে এমন নিরবচ্ছিন্নভাবে, যতোদিন না বিশ্বাস সত্যি তোমার কাছে এসে যায়। সেটাই তোমার মেরাজ– সেটাই তোমার সত্যদর্শন।

মতিন: এই যে বিশ্বাস আসার ব্যাপার, এটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না হুজুর। বিশ্বাস না-ই যদি থাকবে তবে এবাদত করবো কেন।

গুরু: বিশ্বাস থাকা আর বিশ্বাস আসা তো এক কথা নয়। এখানে বিশ্বাস আসার কথা বলা হচ্ছে। বিশ্বাসের আরবি প্রতিশব্দটি হচ্ছে ইয়াকিন। ইয়াকিন আছে বলেই তাঁকে সেজদা করছো। কিন্তু অবিচল সাধনায় এ সেজদা করে গেলে যে ইয়াকিন বা বিশ্বাস আসবে– সে বিশ্বাসের মাত্রিকতা কিন্তু ভিন্ন। ইয়াকিন তিন প্রকারের আইনাল ইয়াকিন, ইলমাল ইয়াকিন এবং হাককুল ইয়াকিন। তোমার রব বা প্রতিপালকের এবাদত অবিচল চিত্তে করে গেলে একদিন তোমার চর্মচক্ষু দিয়েই বাস্তবতাকে দেখবে– চোখের সম্মুখে বাতেনকে দেখতে পাবে। এটাই আইনাল ইয়াকিন। তারপরও যখন তোমার এবাদত অবিরাম তার স্মরণে নিবেদিত হবে তখন তোমার বক্ষ উন্মুক্ত হবে এবং নিগূঢ়তত্ত্বের জ্ঞানভাণ্ডার তোমার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এটাকেই বলা হয়, ইলমাল ইয়াকিন। আর তারপরও যখন তুমি সাধনা করে যাবে তখন আল্লাহর ইচ্ছা হলে একদিন তাঁর মারেফত তোমার নসিব হবে– তাঁর হাকিকত তোমার সামনে উদ্ভাসিত হবে। সত্যের আলোতে তোমার সমস্ত অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে– তুমি শর্তহীনভাবে তাঁর হয়ে যাবে। এটাই হাককুল ইয়াকিন। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কেন ক্রমাগত আরাধনার কথা বলা হয়েছে বিশ্বাস না আসা পর্যন্ত। বিশ্বাস আছে বলেই বিশ্বাসের পথ চেয়ে উন্মুখ হয়ে বসে থাকতে হবে তোমাকে।

মতিন: কিন্তু হুজুর আমাদের মতো দুর্বলমতি মানুষের পক্ষে এমন কঠোর তপস্যা কী করে সম্ভব?

গুরু: মানুষ বলেই সম্ভব। ঐ যে আল্লাহ বলেছেন ওমা খালাকতুল জিননা ওয়াল ইনসা ইল্লা লি'আবুদুন– আমি জিন এবং ইনসান সৃষ্টি করেছি আমার আরাধনার জন্য– আমার এবাদতের জন্য। মানুষকে জানতে হবে এবং মানতে হবে এ জীবনে যা আছে সবই তাঁর। এমনকি আমি নিজেও তাঁর। তাহলেই হবে তাঁর মাঝে নিজেকে সমর্পণ। এই সমর্পণবোধ ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা অর্জিত হতে পারে। নামাজে আল্লাহু আকবর বলার সঙ্গে সঙ্গে যদি চারপাশের দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয় তাহলে সেটা হবে এক ধরনের সমর্পণ। প্রতিদিন নামাজে এই সমর্পণের অভ্যাস হচ্ছে। অন্যদিকে মোশাহেদার মাধ্যমেও এ সমর্পণ হতে পারে। নামাজের কায়দায় বসে ঘাড় ঝুঁকিয়ে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শিথিল করে দাও। তারপর মনে করো, তুমি নেই- অনেক দূরে কোথাও চলে গেছো। সমস্ত শরীর নিঃসাড় অবস্থায় ভাবো যে তোমার সাথে এখন তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। এভাবে অভ্যাস করলে দেখবে একদিন নিজেকে চিনতে পারছো না– তোমার হাত-পা তখন তোমার কাছে অপরিচিত মনে হবে। এ অভ্যাসটি করতে করতে একদিন দেখবে চারপাশে এমন কাউকে দেখছো যাদের কথা শুনেছো– চোখে দেখতে পাওনি। এভাবে সমর্পণ পূর্ণ হলে তোমার ইচ্ছা লুপ্ত হয়ে তোমার মধ্যে তাঁর ইচ্ছা স্থান করে নেবে। তখনই দেখবে তোমার বিশ্বাস তোমাকে ধরা দিয়েছে। এতোদিন যার চরণধ্বনি শুনেছো সে-ই তোমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। তজাল্লিয়াতে রব্বানি বা ঐশী আলো যখন তোমার অন্তরকে উদ্ভাসিত করে দেবে তখন দেখবে দৃশ্যত পৃথিবীর সব কাজই তুমি করছো, কিন্তু তোমার মধ্যে তুমি হারিয়ে গেছো।

মতিন: হুজুর, আল্লাহকে পাবার সহজতম পথ কী?

গুরু: কঠিন পথের আবার সহজ পথ কী? সবচেয়ে সহজ হচ্ছে জীবনের রঙিন প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়া। আর তা না করলে কঠিন পথকেই বেছে নিতে হবে। তবে কেউ যদি কুরআনের একটি কথা নিষ্ঠার সঙ্গে মানতে পারে তাহলে সে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। এরশাদ হচ্ছে– ওমা আ-তা-কুমুর রাসু'লু ফাখুযু'হু ওমা নাহা-কুম আনহু ফানতাহু ওয়াত্তাকুল্লাহ (সুরা হাশর, আয়াত নং-৭)– অর্থাৎ রাসুল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা বর্জন করো এবং আল্লাহকে ভয় করো।

মতিন: আল্লাহকে ভয় করার কথা বলা হচ্ছে কেন– বলা তো উচিত ভালোবাসার কথা।

গুরু: যারা আল্লাহকে চিনে তারা আল্লাহকে ভালো যেমন বাসে তেমনি ভয়ও করে। রাসুল পাক (সা.) বলেছেন– আমি আল্লাহকে তোমাদের চাইতে বেশি চিনি, তাই তাঁকে তোমাদের চাইতে বেশি ভয় করি।

জেনে রেখো, যে প্রেমে ভয় নেই সে প্রেম সত্যিকারের প্রেম নয়। সুতরাং এসো আল্লাহকে ভয় করি এবং রাসুলের এত্তেবা করি। তবেই হয়তো পথের সন্ধান পেয়ে যাবো– তাঁর ইচ্ছা হলে গন্তব্যেও পৌঁছে যাবো একদিন।

শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও ইলমে মারেফত– কুরআন-সুন্নাহ সম্মত কি না

আল্লামা সাইয়্যাদ মুফতি ড. এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী ওয়া সিদ্দিকী জৌনপুরির বয়ান থেকে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আওফ বিন মালেক আশজায়ি (রা.) বলেন, আমরা ৯ জন কিংবা ৮ অথবা ৭ জন নবী করিম (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হযরত নবী করিম (সা.) বললেন, তোমরা কি আল্লাহর রাসুলের হাতে বাইয়াত হবে না? আমরা নিজ নিজ হাত প্রসারিত করে দিলাম এবং বললাম– হে আল্লাহ পাকের রাসুল (সা.) কোন বিষয়ের বাইয়াত হবো? নবীজী পাক (সা.) বললেন, এই বিষয়ের ওপর যে তোমরা আল্লাহ পাকের এবাদত করবে। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করবে এবং যাবতীয় হুকুম-আহকাম শুনবে ও মান্য করবে।– (মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাই শরিফ)।

পীর-মাশায়েখদের মধ্যে বাইয়াত করার যে প্রথা প্রচলিত তার সারমর্ম হলো জাহেরি ও বাতেনি আমলের ওপর দৃঢ়তা অবলম্বন করা এবং গুরুত্ব প্রদান করার অঙ্গীকার করা। তাদের পরিভাষায় একে বলা হয় বাইয়াতে তরিকত অর্থাৎ তরিকতের কাজ বা আমল করার অঙ্গীকার করা। কোনো কোনো স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন আন্তর্জাতিক বক্তা এই বাইয়াতকে নাজায়েজ বলে থাকেন। কারণ হিসেবে বলেন যে, হুজুর পাক (সা.) থেকে এটা বর্ণিত নেই। তখন শুধু কাফেরদের ইসলামে বাইয়াত করার দরকার ছিল। কিন্তু উল্লিখিত হাদিস শরিফে এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। তাই অনেক ইমাম মুজতাহিদ আলেম বলেছেন– 'মান লাযসা লাহু শায়েখুন ফা-শায়েখুশ শয়তান'।– (ইমাম গাজ্জালি)। হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.), হযরত জোনায়েদ বাগদাদিও (রহ.) বলেছেন– অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কোনো হাক্কানি পীর বা শায়খ গ্রহণ করেনি তার শায়খ বা ওস্তাদ হলো শয়তান।' শয়তানই তাকে গোমরাহ বা বিভ্রান্ত করে দেয়। কাজেই গোমরাহি থেকে বাঁচা যেহেতু ফরজ, সেহেতু পীরের কাছে বাইয়াত হওয়া ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই পীর সাহেবের কাছে বাইয়াত হওয়াও ফরজ। আর ঠিক এ কথাটি বলেছেন আমাদের হানাফি মাজহাবের ইমাম, ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.)। তিনি বলেন, 'লাওলা সানাতানি লাহা লাকা আবু নোমান।' অর্থাৎ 'আমি নোমান বিন সাবিত দুটি বছর যদি না পেতাম তবে হালাক হয়ে যেতাম।' অর্থাৎ যদি আমি আমার পীর সাহেব ইমাম বাকের ও ইমাম জাফর সাদেক (রা.)-এর কাছে বাইয়াত হয়ে দুটি বছর অতিবাহিত না করতাম তবে আত্মশুদ্ধি লাভ না করার কারণে গোমরাহ ও হালাক হয়ে যেতাম। আর বিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও আলেমকুল শিরোমণি বিশিষ্ট সুফি সাধক হযরত মওলানা জালালুদ্দিন রুমি (রহ.) বলেন : আমি মওলানা রুমি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহওয়ালা হতে পারিনি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পীর হযরত শামসে তাবরিজ (রহ.)-এর কাছে বাইয়াত হয়ে ইলমে তাসাউফ আমল করে ইখলাস হাসিল না করেছি অর্থাৎ এলমে তাসাউফ আমলের মাধ্যমে ইখলাস অর্জন করার পরই আমি হাকিকি মুমিন হতে পেরেছিলাম। – (তিরমিজি)। তাই কাদেরিয়া তরিকার ইমাম হযরত গাওসুল আযম মাহবুবে সোবহানি কুতুবে রব্বানি গাওসে সামদানি শায়খ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'সিররুল আসরার'-এর ৫ম অধ্যায়ে তওবার বয়ানে লিখেছেন– কুলব বা অন্তরকে জীবিত বা যাবতীয় কু-রিপু থেকে পবিত্র করার জন্য আহলে তালকিন অর্থাৎ পীরে কামেল গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ। হাদিস শরিফে যে ইলম অর্জন করা ফরজ বলা হয়েছে তাদ্বারা ইলমে মারেফত ও কোরবতকেই বুঝানো হয়েছে। এ ছাড়া আরো অন্য সর্বজনমান্য ও সর্বজন স্বীকৃত ইমাম মুজতাহিদ ও আওলিয়া-ই কিরামবর্গ (রহ.) পীর সাহেবদের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করা ফরজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

যেমন হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাজ্জালি (রহ.) তাঁর ইহইয়াও উলুমুদ্দিন ও কিমিয়ায়ে সায়াদাত কিতাবে, হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতি আজমেরী (রহ.) তাঁর লিখিত আনিসুল আরওয়াহ কিতাবে, ইমামুশ শরিয়ত ওয়াত তরিকত শায়েখ আবুল কাশেম কুশাইরি (রহ.) রিসালায়ে কুশাইরিয়া কিতাবে, হযরত মওলানা কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) মালাবুদ্দা মিনহু ও এরশাদুত্তালেবিন কিতাবে, শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) তাফসিরে আজিজ নামক কিতাবে, হাফিজে হাদিস আল্লামা রুহুল আমিন (রহ.) তাসাউফ তত্ত্ব বা তরিকত দর্পণ নামক কিতাবে, আল্লামা শামি (রহ.) রদ্দুল মুহতার কিতাবে, ইমাম ফকরুদ্দিন রাজি (রহ.) তার তাফসিরে কবির কিতাবে, কাইয়্যুমে আউয়াল আফজালুল আউলিয়া হযরত ইমাম মোজাদ্দেদ আলফে সানি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত আলোড়ন সৃষ্টিকারী মকতুবাদ শরিফে, হযরত ইমাম আহমদ রেফায়ি (রহ.) তাঁর বুনইয়ানুল মুশাইয়্যদ কিতাবে, হযরত ইসমাঈল হাক্কি (রহ.) তাফসিরে রুহুল বয়ানে সরাসরি পীর গ্রহণ করা ফরজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে হাদিয়ে বাঙ্গাল মুজাহিদে আজম শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা শাহ কারামত আলী জৌনপুরি (রহ.) তাঁর যাদুত তাকওয়াতে লিখেছেন যে, ইলমে তাসাউফ ছাড়া ইলমে শরিয়তের ওপর যথাযথ আমল করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং সাবেত হলো যে, ইলমে মারেফত চর্চা করা সবার জন্যই ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। আর এই ইলমে তাসাউফে পারদর্শী মুর্শিদে কামেলের সোহবত ও তালিম ছাড়া তা অর্জন করা কখনো সম্ভব নয়।

মওলানা শফি সাহেব স্বয়ং নিজেই মা'আরেফুল কুরআনে সুরা বাকারায় উক্ত আয়াত শরিফের তাফসিরে লেখেন– আত্মশুদ্ধি অর্জিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এসলাহ প্রাপ্ত কোনো বুজুর্গ বা পীরে কামেলের অধীনে থেকে তালিম ও তরবিয়াত হাসিল না করবে। আমল করার হিম্মত তাওফিক কোনো কিতাব পড়া ও বুঝার দ্বারা অর্জিত হয় না; তা অর্জন করার একটিই পথ, তা হলো ওলিদের সোহ্বত। খাঁটি ওলির সোহ্বত– হাদিস শরিফ অনুসারে মাত্র ৪০ দিনের মধ্যে কুলব জারি হওয়া বুঝতে পারা।

পীরই হচ্ছেন হাকিকি আলেম। কেননা পীরই ইলমে শরিয়ত ও মারেফত– এই উভয় প্রকার ইলমের অধিকারী। আর ঐ উভয় প্রকারের ইলমের অধিকারীরাই হচ্ছেন প্রকৃত আলেম বা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া। যেমন এ প্রসঙ্গে ইমামে রব্বানি মাহবুবে সুবহানি কাইয়ুমে আওয়াল সুলতানুল মাশায়েখ হযরত মোজাদ্দেদ আলফে সানি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব মকতুবাত শরিফে উল্লেখ করেন– আলেমরা নবীদের ওয়ারিশ। এ হাদিস শরিফে বর্ণিত আলেম তাঁরাই যাঁরা নবীদের রেখে যাওয়া ইলমে শরিয়ত ও ইলমে মারেফত– এই উভয় প্রকার ইলমের অধিকারী। অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত ওয়ারিশ– স্বত্বাধিকারী। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র এক প্রকারের ইলমের অধিকারী সে ব্যক্তি নবীদের প্রকৃত ওয়ারিশ নন। কেননা পরিত্যক্ত সম্পত্তির সকল ক্ষেত্রে অংশীদারী হওয়াকেই ওয়ারিশ বলে। আর যে ব্যক্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোনো নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী হয় তাকে গরিম বলে। অর্থাৎ সে ওয়ারিশ নয়। গরিমের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে যারা পীর নন অর্থাৎ শুধু ইলমে শরিয়তের অধিকারী, ইলমে তাসাউফ-শূন্য তারা আলেম তো ননই বরং চরম ফাসিক।

অতএব, প্রমাণিত হলো– হাক্কানি পীররাই হচ্ছেন প্রকৃত বা খাঁটি আলেমে দ্বীন। কুলব জারি করতে হলে তাদের কাছে যেতে হবে। যে ব্যক্তি কোনো পীর সাহেবের কাছে বাইয়াত হয়ে আত্মশুদ্ধি লাভ করত খেলাফতপ্রাপ্ত হননি তার কাছে বাইয়াত হওয়া হারাম। অতএব, আত্মশুদ্ধি ও ইলমে তাসাউফ অর্জন করা যেহেতু ফরজে আইন। আর কামেল পীর ছাড়া ইলমে তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব নয় সেহেতু একজন কামেল পীর অন্বেষণ করা এবং বাইয়াত গ্রহণ করা ফরজ। এটাই গ্রহণযোগ্য বিশুদ্ধ ও দলিল ভিত্তিক ফতোয়া। এর বিপরীত মত পোষণকারীরা বাতিল ও গোমরাহ।

তথ্যসূত্র : তাফসিরে খাজেন, বাগবি, কুরতবি, ফতহুল কাদির, এবনে কাসির, তাবারি দুররে মানসুর, রুহুল বয়ান, রুহুল মায়ানি, মা'আরেফুল কুরআন, বায়হাকি, মুসলিম, তিরমিজি ইত্যাদি।

‘মারকাজে একটি দিন’

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ

১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৯। বৃহস্পতিবার, ডিওএইচএস-এর মারকাজ। বাদ মাগরিব।

সেদিন সন্ধ্যায় হুজুর জৌনপুরি (রহ.) মাগরিবের নামাজ শেষ করে আমাদের মাঝে এসে বসলেন। তাঁর বসার জায়গাটা নির্দিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু তাতে কোনো তাকিয়া বা আলাদা জাঁকজমকপূর্ণ কোনো কিছু দিয়ে চিহ্নিত করা ছিল না। আমরা যে ক’জন (প্রায় জনা ত্রিশেক) চার দেয়ালের পাশে বসতাম। আমাদের প্রত্যেকের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এটা কোনো নিয়ম বা নির্দেশের ব্যাপার ছিল না। তাঁর চোখ আমাদের নির্দিষ্ট স্থানেই খুঁজতো। মুর্শিদের দরবারে এটাই নাকি বসার রেওয়াজ। যাহোক আমি তখন তাঁর তিন-চারজন পর তাঁর হাতের ডানদিকে একটা জায়গায় বসতাম। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি তন্ময় হয়ে আমাদের তরিকতের তালিম বা শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন– তরিকত হাসিল বা অর্জন করার তিনটি পথ। এগুলো হচ্ছে– এক. তাসাব্বুরে শায়খ। দুই. জিকির। তিন. মোরাকাবা।

তাসাব্বুরে শায়খ :

তাসাউর বা তাসাব্বুর কথাটা এসেছে তসবির থেকে। তসবির মানে হচ্ছে ছবি। পীরকে শায়খ বলা হয়। সুতরাং তাসাউরে শায়খ মানে হচ্ছে নিজ মুর্শিদের চেহারাকে ধ্যান করা। এর নিয়ম হচ্ছে রাতে নির্জনে নামাজের অবস্থায় বসতে হবে। এ অবস্থায় একাগ্র চিত্তে নিজের দুই ভ্রূর মাঝখানে মুর্শিদের চেহারাকে ধ্যান করতে হবে। তবে তার আগে আল্লাহকে স্মরণ করে নিজের মনকে সম্পূর্ণ আসক্তি-মুক্ত করতে হবে। এভাবে ধ্যান করলে মুর্শিদের চেহারা নিজ অন্তরে মূর্ত হয়ে উঠবে। এর ফলে যা লাভ হবে তা হচ্ছে নিজ মুর্শিদের আধ্যাত্মিক অর্জনের মাত্রিকতা বা ডাইমেনশন গুলোর ফায়েজ তার মধ্যে চলে আসবে। এই ডাইমেনশন গুলো বহুবিধ, তবে তার সংখ্যা কমপক্ষে বারটি। এরপর হুজুর রাসুলে পাক (সা.)-এর একটি হাদিস তেলাওয়াত করেন। তারপর তার ব্যাখ্যা করে বলেন– এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ ভালোমন্দের পার্থক্য ভুলে যাবে। তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ইমামে জামানাকে না চিনে মৃত্যুবরণ করে অথবা তাঁর সম্মান না করে তবে সে জাহেলের মৃত্যুবরণ করবে। এ পর্যায়ে তিনি শেখ সাদির দুটি চরণ আবৃত্তি করেন যার বাংলা তর্জমা হলো– এ সৌভাগ্যের চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে/তিনি যাকে খুশি তাকে দান করতে পারেন।

অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ এ ধরনের সৌভাগ্য যা কেবল আল্লাহই মানুষকে দান করতে পারেন।

জিকির :

জিকিরের সাদামাটা বাংলা অর্থ হলো আল্লাহর স্মরণ। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণ। আর যেহেতু মুর্শিদ নিজে আল্লাহতে সমর্পিত, আল্লাহর সত্তার মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত– সুতরাং তাঁকে স্মরণও আল্লাহরই স্মরণ। মানুষ তার দেহের প্রবৃত্তির তাড়নায় এ পৃথিবীর লোভ-লালসায় তাড়িত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। প্রকৃত সাধক পৃথিবীর সব হক আদায় করেন কিন্তু তার মন পড়ে থাকে আল্লাহর কাছে। অন্য একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন– প্রকৃত সাধক হচ্ছে সেই মা পাখিটির মতো, যে গাছের ডালে নিজের বাসায় বসে ডিমে তা দিচ্ছে। তার চোখ বাইরের দৃশ্যাবলি অবলোকন করছে। দৃশ্যমত সে সবই দেখছে, কিন্তু তার মন পড়ে আছে ডিমের মধ্যে যার ওপর সে বসে তা দিচ্ছে।

মোরাকাবা :

মোরাকাবাও এক ধরনের ধ্যান। একাগ্রচিত্তে ধ্যান। তবে তওবার মোরাকাবার বিশেষ নিয়ম আছে। নামাজের ভঙ্গিতে নির্জনে বসতে হবে। বুকে হাত রেখে নিম্নলিখিত নিয়ত করতে হবে।

‘ম্যায় মোতাওয়াজ্জা হোতা হুঁ মেরে কালব কি তরফ/মেরা কালব মোতাওয়াজ্জা হ্যায় আল্লাহকে আরশ কি তরফ/মেরে মুর্শিদকে ওয়াসিলে সে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহেস সালামকে কালব মোবারকসে মেরে কালব মে তওবা কা ফায়েজ আয়ে’।

অনুবাদ : আমি ধ্যানস্থ হলাম আমার কালবের প্রতি/আমার কালব ধ্যানস্থ হলো আল্লাহর আরশের দিকে/আমার মুর্শিদের অসিলায় রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লামের পবিত্র কালব মোবারক থেকে আমার কালবে তওবার ফায়েজ আসুক।

তারপর এ ধ্যানের অবস্থায় জীবনের প্রতিটি ছোট-বড় গুনাহকে স্মরণ করতে হবে। আর প্রতিবারই গুনাহ স্মরণ করে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তে হবে–

‘রাব্বানা যালাম না আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসেরিন’।

অনুবাদ : হে আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের নফসের ওপর অত্যাচার করেছি– তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের দয়া করো– তা না হলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। এ দোয়া প্রতিটি গুনাহর কথা স্মরণ করে প্রতিবারই পড়তে হবে। ঐ রাতে তিনি আমাদের যে কারণেই হোক রাত বারটা থেকে সুবাহ কাজিব পর্যন্ত হুজুরের তাসাউর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ আদেশ তিনি পরবর্তী স্মরণে অবশ্যই প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

(প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ প্রণীত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহ.)-এর *সুফিতত্ত্ববোধিনী কথামৃত সাগর* গ্রন্থ থেকে সংকলিত)

আত্মার উপলব্ধিতে স্রষ্টার উপলব্ধি

শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি

** শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি (জন্ম ১৯৩৫ - পবিত্র ভূমি জেরুসালেম) হযরত মুহম্মদ (সা.) এর বংশধর এবং বর্তমানে সাজিলিয়া সুফি তরিকার মুর্শিদ। জেরুসালেমস্থ সুফি কাউন্সিলের তিনি প্রধান এবং দীর্ঘদিন মসজিদ আল-আকসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী। তিনি বর্তমানে ফিলিস্তিনে বসবাস করেন এবং তার মুরিদদের জন্য আমেরিকায় ভ্রমণ ও অবস্থান করে থাকেন। **

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

আশ-শাওক (ব্যাকুলতা): প্রিয়তমকে পাওয়ার জন্য অন্তরের যে তীব্র ব্যাকুলতা তাকে শাওক বা শক্ বলে। যা কিছু তৃপ্তিকর, আনন্দদায়ক ও মনোরকম তার প্রতি ভালোবাসা একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ। আল্লাহর প্রতি সালিকের যে ভালোবাসা তা হলো খোদার উপস্থিতির যে সৌন্দর্য্য ও মনোরমতা সেটির প্রতি তাদের অন্তরের আকর্ষণ। তারা যে ধরনের ব্যাকুলতা অনুভব করে তা তাদের অন্তরের ভালোবাসাকে প্লাবিত করে যা তাদেরকে ব্যাকুলতার লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত করে। এটি ইশক বা গভীর ভালোবাসা ও প্রেমে সালিককে অভিভূত করে যে তাঁকে অভিভূত করেছে তার প্রতি মিলনে আকৃষ্ট করে। ইশক হলো এক ও অদ্বিতীয়ের প্রতি সেই গভীর ভালোবাসা ও প্রেম যা ভাষার অতীত এবং এই মাকামে অন্য সকল মাকাম যেমন: ব্যাকুলতা, পরমানন্দ, সমাধি, আবেগ, বিস্ময় এবং বিলীণ হওয়া নিহীত।

যেহেতু মানুষ তার বা সেই বস্তুও জন্যই ব্যাকুল হয় যাকে সে দূরে এবং যাকে নিজের থেকে অনুপস্থিত মনে করে, সেহেতু সুফিরা কখনো কখনো এই ব্যাকুলতাকে একটি সংকটজটক অসুখের সাথে তুলনা করে থাকেন। অথচ মহাসত্য যে আল্লাহ তিনি সদাই উপস্থিত এবং কখনোই বান্দা থেকে দূরে নন। এ কারনেই সুফিদের যে তত্ত্ব তা মুশাহাদা বা প্রত্যক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ আল্লাহর ও তার নিদর্শনকে সকল সময়ে পর্যবেক্ষন এবং প্রত্যক্ষণ করা। ব্যাকুলতা প্রকৃত বাস্তবে হৃদয়ে জ্বলা আগুনের মতো যা পুরো অন্তরকে দখল করে নেই এবং সেই আগুন একমাত্র প্রিয়তমের মিলনের মাধ্যমেই নিভানো সম্ভব। সুফিরা কখনো কখনো বলে থাকে, "ব্যাকুলতা হৃদয়ে উঠে আসা একটি আগুন যা যে ব্যাকুল এবং যার জন্য ব্যাকুল এই দুইয়ের ভিতরে তফাৎ সৃষ্টি করে রাখে। আর যখন উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে তখনই এই আগুন নিবারিত হয়।"

সুফি ধারার বেশিরভাগ গুপ্তভেদ জানা যায় যদি ব্যাকুলতা বিহীনভাবে প্রিয়তমকে প্রত্যক্ষ করা হয়। একজন সুফিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল "তুমি কি খোদার জন্য ব্যাকুল?" সে উত্তর দিয়েছিল, "না। ব্যাকুলতো মানুষ তার জন্য হয় যে তার থেকে অনুপস্থিত, যে দূরে; আর আল্লাহ সুবহানুহুয়াতালা - তিঁনি তো সদাই বিদ্যমান, উপস্থিত।"

ওয়া হুয়া মা'কুম, আয়নামা কুনতুম।
তিঁনি তোমাদের সাথেই আছেন, যেখানেই তোমরা থাকো না কেন। সুরা হাদিদ (৫৭:৪)

আল-হাল (অবস্থা): সুফি পরিভাষা হাল হলো হৃদয় বা অন্তরের সেই অবস্থা যা কোন ধরনের দাবি, অর্জন বা চেষ্টা চরিত্রের মাধ্যম ছাড়াই চলে আসে। এটি হতে পারে দু:খ, সংকোচন, প্রসারন, শ্রদ্ধার ভাব, আনন্দ ইত্যাদি। কিন্তু এটি হৃদয়ে বা অন্তরে দীর্ঘসময় থাকে না যে কারনে এটিকে একটি অবস্থা বা হাল বলা হয় এবং যখন একটি নির্দিষ্ট হাল হৃদয়ে আসন নেয় তখন সেটিকে সুফি পরিভাষায় বলা হয় মাকাম।

হাল হলো উপরওয়ালার তরফ থেকে উপহার। মাকামও উপহার কিন্তু অর্জন প্রকাশিত হয় এবং উপহার দেওয়া লুক্কায়িত থাকে কিন্তু হালের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিপরীত। সেখানে অর্জন লুক্কায়িত থাকে বা প্রকাশ হয় না কেননা হাল দ্রুতই বিলীন হয় কিন্তু তা যে উপরওয়ালার তরফের উপহার বান্দার কোন ধরনের প্রচেষ্টা ছাড়া - এই বিষয়টি প্রতিভাত হয়। হাল যখন স্থায়ীত্ব পায় তখন তা মাকামে রূপান্তরিত হয়। এটি অর্জন সম্ভব আনুগত্যের ভিতর দিয়ে। বান্দা ক্ষেত্র বিশেষে হালের কারন হয়তো ঠাওর করতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই তার ভিতরে হৃদয়ের আধ্যাত্মিক সংকোচন বা প্রসারণ ঘটতে পারে তার কারন না বুঝেই।

ইয়াকিন (নিশ্চিত বিশ্বাস): আয়াত বা নিদর্শন বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে যৌক্তিক ধীশক্তির ব্যবহারে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা হলো ইয়াকিন। আইন আল-ইয়াকিন বা অভিজ্ঞতালবদ্ধ বিশ্বাস হলো তা যা অর্জিত হয় প্রত্যক্ষীকরণের মাধ্যমে। আল হক্ক আল-ইয়াকিন হলো সেই ইয়াকিন যা বান্দা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব ত্যাগ (ফানা) এবং পরমসত্যের মাঁঝে স্থিত (বাকা) হওয়ার মাধ্যমে অর্জন করে। মারিফাত এবং মুশাহাদা বা স্রষ্টাকে চেনা-জানা এবং তাকে প্রত্যক্ষীকরণের মধ্যদিয়ে আল হক্ক আল-ইয়াকিনের অর্জন হয়।

প্রকৃতপক্ষে বান্দার থেকে যা ফানা হয় তা হলো তার বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব, তার স্বকীয়তা (সেলফ) নয়, যার ফলে বান্দার যে মূল তা অবশ্যই যেন অস্তিত্ব বজায় রাখে। কেউ কেউ মনে করে থাকে বা এভাবে বলে যে বান্দার ক্ষনস্থায়ী অস্তিত্ব পরমসত্য অস্তিত্বে বিলীণ হয়ে যায় যা প্রকৃতপক্ষে ঘটে না। যতক্ষন পর্যন্ত বান্দা আল্লাহকে তার গোলামী ও অধীনতার মাধ্যমে, তার অসহায়ত্ব ও অনুপায় অবস্থা স্বীকার করে অগ্রসর হতে থাকে এবং যতক্ষন পর্যন্ত তার ভিতরের স্রষ্টার গোলামীর বিরোধপূর্ণ গুনাবলী থাকে যা এক এক করে ফানা হতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ বান্দার উপরে তার অনুগ্রহ ও আশীষ বর্ষণের মাধ্যমে বান্দার ত্রুটিযুক্ত বৈশিষ্ট্য ও সিফাতকে প্রসংশনীয় বৈশিষ্ট্য ও সিফাতের মাধ্যমে বদল করতে থাকেন। কেননা আল্লাহ সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান এবং তিনি পরিপূর্ণভাবে সক্ষম এবং তিনি কোন কিছুর উপরে মুখাপেক্ষী নন। তিঁনি যা প্রদান করেন, কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারেন না এবং তিনি যা উহ্য রাখেন তা প্রদান করার ক্ষমতা কারো নেই। যা তিনি নির্ধারন করেছেন তা কেউ রোধ করতে পারে না এবং তার রায় পরিবর্তনকারী কেউ নেই। যদি আল্লাহ তার বান্দাকে উপহার দিয়ে তাকে তবে বান্দা মাওলার ইচ্ছায় সম্পূর্ণ মহাজগতকে সামলাতে পারে। সুতরাং এটা ভাবার কোন অবকাশ নেই যে বান্দার ক্ষনস্থায়ী অস্তিত্ব পরম অস্তিত্বে (*আয যাত আল-হক্ক*) ফানা হয় কেননা প্রকৃত বাস্তবে পরম অস্তিত্বে আল হক্ক বা সত্য ভিন্ন আর কিছু নেই।

(চলবে) **অনুবাদক: সাদিক মুহাম্মদ আলম**

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ ডেভলপমেন্ট ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৮/১ তেজকুনিপাড়া, ফার্মগেট, ইলিক্রস কলেজ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ থেকে মুদ্রিত।